

আল-ফিকহুল আকবর

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ইসমাতুল আশিয়া, সাহাবায়ে কেরাম, তাকফীর, সুন্নাহ ও ইমামাত

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

১০. ৫. ৪. জিহাদ ফরয কিফায়া

আমরা বলেছি যে, খারিজীগণ জিহাদকে ফরয আইন প্রমাণের জন্য জিহাদের ফযীলত ও নির্দেশ বিষয়ক সাধারণ আয়াত ও হাদীস পেশ করেন। উপরে কয়েকটি হাদীস আমরা উল্লেখ করেছি। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِزْرَكُمْ فَانْفِرُوا تُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন কর এবং (যুদ্ধে) বেরিয়ে যাও দলে দলে অথবা বেরিয়ে যাও একত্রে।”[1]

খারিজীগণ বলেন, এ সকল আয়াত ও হাদীসে মুমিনদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু কারো অনুমতি বা নেতৃত্ব গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয় নি। এতে প্রমাণ হয় যে, জিহাদ ফরয আইন, এর জন্য কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই।

তাঁরা বলেন: মহান আল্লাহ বলেছেন: “তোমাদের উপর সিয়াম লিপিবদ্ধ করা হলো”[2] এবং তিনিই বলেছেন: “তোমাদের উপর কিতাল (যুদ্ধ) লিপিবদ্ধ করা হলো”[3]। কাজেই সিয়াম যেমন ফরয আইন তেমনি কিতাল বা যুদ্ধও ফরয আইন।

তাঁদের বিভ্রান্তির কারণ কুরআন-হাদীসের কিছু বক্তব্যকে সুন্নাতে নববীর সামগ্রিক আওতা থেকে বের করে অনুধাবনের চেষ্টা। কুরআন ও হাদীসে মানব জীবনের সকল দিকের বিধিবিধান বিদ্যমান। প্রত্যেক বিধান পালনের জন্য নির্ধারিত শর্তাদি রয়েছে। তবে কোনো ইবাদতের শর্তাবলি কুরআনে একত্রে বা একস্থানে উল্লেখ করা হয় নি। এছাড়া অধিকাংশ ইবাদতের সকল শর্ত কুরআনে উল্লেখ করা হয় নি। কুরআন ও হাদীসের সামগ্রিক বিধান বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) –এর সামগ্রিক জীবন ও এ সকল নির্দেশ পালনে তাঁর রীতি-পদ্ধতি থেকেই সেগুলোর শর্ত ও পদ্ধতি বুঝতে হবে। তা না হলে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ

“সূর্য ঢলে পড়া থেকে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে।”[4]

এ নির্দেশের উপর নির্ভর করে যদি কেউ সূর্যাস্তের সময় সালাতে রত হন তবে তিনি নিজে যতই দাবি করুন, মূলত তা ইসলামী ইবাদাত বলে গণ্য হবে না, বরং তা পাপ ও হারাম কর্ম বলে গণ্য হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাদীস শরীফে ‘সূর্য হলে পড়ার পর থেকে রাত্রি পর্যন্ত’ সময়ের মধ্যে সালাত আদায়ের বৈধ ও অবৈধ

সময় চিহ্নিত করেছেন এবং সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় অবৈধ করেছেন। এভাবে আমরা দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর শিক্ষার বাইরে মনগড়াভাবে কুরআন কারীমের অর্থ বা ব্যাখ্যা করা আমাদেরকে ইবাদতের নামে পাপের মধ্যে লিপ্ত করে।

জিহাদ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসও অনুরূপ। কোথাও সাধারণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং কোথাও এর স্তর ও বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ...

মুমিনদের মধ্যে যারা কোনো অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও (জিহাদ না করে) ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। উভয় প্রকারের মুমিনকেই আল্লাহ কল্যাণের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।”[5]

এ আয়াতে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে, জিহাদ ফরয কিফায়া ইবাদত। কোনো অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ জিহাদ পরিত্যাগ করে তবে সে পাপী হবে না। তবে যারা এ ইবাদত পালন করবেন তাঁরাই শুধু এর সাওয়াব ও মর্যাদা লাভ করবেন।

খারিজীগণ সাধারণভাবে ধার্মিক ও সমাজের পাপাচারে ব্যথিত। তবে দ্রুত সব কিছু ভাল করে ফেলার আবেগ এবং বিরোধী মানুষদেরকে নির্মূল করার আক্রোশ একত্রিত হয়ে তাদেরকে অন্ধ করে ফেলে। তারা দুটি বিষয়ের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকেন: (১) যে কোনো অজুহাতে মুসলিমকে কাফির বলে প্রমাণ করা এবং (২) যে কোনো অজুহাতে জিহাদের নামে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সশস্ত্র আক্রমণ বৈধ করা। জিহাদ ফরয কিফায়া এবং জিহাদের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে যদি কোনো ফকীহের বক্তব্য তাদেরকে বলা হয় তবে তারা বলেন: আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এর কথা ছাড়া কিছুই মানি না। আবার যখন তাদের মতের বাইরে কুরআন বা হাদীসের বক্তব্য তাদের সামনে পেশ করা হয় তখন বলেন: অমুক বা তমুক আলিম এগুলোকে মানসূখ বা রহিত বলেছেন! আর এ পদ্ধতিতেই তারা উপরের আয়াতটিকেও মানসূখ বা রহিত বলে দাবি করেন।

কোনো কোনো আলিম মানসূখ শব্দটি ব্যাখ্যা ও সমন্বয় অর্থে ব্যবহার করতেন। যেমন এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, সক্ষম ব্যক্তি জিহাদ না করলে কোনো সময়ে ও কোনো অবস্থাতেই কোনো অপরাধ হবে না। কিন্তু সূরা তাওবায় আল্লাহ জানিয়েছেন যে, রাষ্ট্রপ্রধান নির্দেশ দেওয়ার পরে জিহাদ না করা কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।[6] এজন্য কোনো আলিম বলেছেন যে, তাওবার আয়াত দ্বারা মায়িদার আয়াত মানসূখ। অর্থাৎ একটি বিশেষ সময়ে ও বিশেষ অবস্থায় জিহাদ ফরয কিফায়া হওয়ার বিধানটি রহিত হয় এবং জিহাদ পরিত্যাগকারী পাপী হয়। এটি হলো রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশের অবস্থা। এরূপ স্বাভাবিক সমন্বয় ছাড়া কুরআনের মধ্যে বিদ্যমান কোনো আয়াতকে রহিত বলে দাবি করার অর্থ মানুষের কথায় বা মানুষের মন-মর্জি অনুসারে ওহীকে বাতিল করা।

হাদীস শরীফে বিষয়টি আরো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَبِّئُ النَّاسَ بِذَلِكَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ ... فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُّوهُ الْفِرْدَوْسَ ...

“যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর উপর ঈমান আনবে, সালাত কায়েম করবে, রামাদানের সিয়াম পালন করবে আল্লাহ নিজ দায়িত্বে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে ব্যক্তি আল্লাহর রাসত্বায় হিজরত করুক অথবা যে মাটিতে সে জন্মগ্রহণ করেছে সেখান থেকে বসে থাকুক। তখন সাহাবীগণ বলেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি এ বিষয়টি মানুষদেরকে জানিয়ে দেব না? তখন তিনি বলেন: জান্নাতের মধ্যে ১০০টি মর্যাদার স্তর বিদ্যমান যেগুলোকে আল্লাহ তাঁর রাসত্বায় জিহাদকারীদের জন্য তৈরি করেছেন... তোমরা যখন চাইবে তখন ‘ফিরদাউস’-ই চাইবে...।”[7]

অর্থাৎ ফরয আইন ইবাদতগুলো পালনের পর মুমিনের উচিত কাফির দেশ থেকে হিজরত করে দারুল ইসলাম বা ইসলামের রাষ্ট্রে এসে রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্বে জিহাদে শরীক হওয়া। যদি তিনি হিজরত ও জিহাদে অংশ গ্রহণ না করেন তবে পাপী বলে গণ্য হবেন না। বরং ফরয আইন ইবাদতগুলো পালন করার কারণে মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাত প্রদান করবেন। কিন্তু তা হলো সর্বনিম্ন মর্যাদার জান্নাত। জিহাদের মাধ্যমে মুমিন উচ্চতর মর্যাদার জান্নাত লাভ করেন। মুমিনের উচিত জিহাদের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ জান্নাতের বাসনা হৃদয়ে লালন করা ও আল্লাহর কাছে তা প্রার্থনা করা।

এ অর্থে এক হাদীসে আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন:

إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ (يا رسول الله)؟ فَقَالَ رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ مُؤْمِنٌ مُعْتَزِلٌ فِي شُعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ رَبَّهُ (وفي رواية: يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ) وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

“একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে বলে, হে আল্লাহর রাসূল, সর্বোত্তম মানুষ কে? তিনি বলেন: যে মুমিন নিজের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। লোকটি বলে, এরপর সর্বোত্তম কে? তিনি বলেন: যে মুমিন মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী বিজন উপত্যকায় থেকে তার প্রতিপালকের ইবাদত করে (দ্বিতীয় বর্ণনায়: এভাবে নির্জনে একাকী সে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, মৃত্যু আগমন পর্যন্ত তার প্রতিপালকের ইবাদত করে) এবং মানুষের কোনো ক্ষতি করে না।”[8]

এভাবে জিহাদকারী সর্বোত্তম মর্যাদা লাভ করলেন। এর বিপরীতে সমাজ ও জিহাদ পরিত্যাগ করে বিজনে নির্জনে একাকী বসবাস করে দীনের আরকান ও আহকাম পালনের কারণে দ্বিতীয় ব্যক্তি মর্যাদায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। তিনি জিহাদের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হলেন, তবে পাপী বলে গণ্য হলেন না।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। তাদের প্রতিটি দল থেকে একাংশ বের হয় না কেন? যাতে তারা দীনের জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, যেন তারা সতর্ক হয়।”[9]

এখানে আল্লাহ সকলকে অভিযানে না অথবা বেরিয়ে প্রত্যেক দল থেকে কিছু মানুষকে এ ইবাদত পালনের নির্দেশ দিলেন। ফরয আইন ইবাদতের ক্ষেত্রে এরূপ সুযোগ নেই। আমরা বলতে পারি না যে, মুমিনগণ সকলেই সালাত বা সিয়াম পালন করবে না, বরং কেউ তা পালন করবে এবং অন্যরা অন্য দায়িত্ব পালন করবে।

ফরয আইন ইবাদত পালনের জন্য কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই। উপরন্তু কেউ নিষেধ করলে বা বাধা দিলেও মুমিনের দায়িত্ব সকল বাধা উপেক্ষা করে তা পালন করা। পক্ষান্তরে ফরয কিফায়ার ক্ষেত্রে অনুমতি গ্রহণের অবকাশ আছে। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পিতামাতার অনুমতি বা খিদমতের দায়িত্বের কারণে জিহাদ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। এক হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) বলেন:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحْيٍ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ (فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَهُمَا)

“একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর কাছে এসে জিহাদের অনুমতি প্রার্থনা করে। তিনি বলেন: তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছেন? সে বলে: হ্যাঁ। তিনি বলেন: তোমার পিতামাতাকে নিয়ে তুমি জিহাদ কর। (অন্য বর্ণনায়: তাহলে তুমি তোমার পিতামাতার কাছে ফিরে যাও এবং সুন্দরভাবে তাঁদের খেদমত ও সাহচর্যে জীবন কাটাও।”[10]

অন্য হাদীসে আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন:

أَنَّ رَجُلًا هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ: هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ قَالَ: أَبَوَايَ. قَالَ: أَذِنَا لَكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا.

“একব্যক্তি ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর নিকট হিজরত করে আসে। তিনি তাকে বলেন: ইয়ামানে তোমার কেউ কি আছেন? লোকটি বলে: আমার পিতামাতা আছেন। তিনি বলেন: তারা কি তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন? লোকটি বলে: না। তিনি বলেন: তুমি তাদের কাছে ফিরে যেয়ে অনুমতি চাও। যদি তারা অনুমতি দেন তবে জিহাদ করবে। তা নাহলে তুমি তাদের খিদমত করবে।”[11]

এ সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, জিহাদ ফরয কিফায়া। ফরয আইন হলে এরূপ বলা যায় না। আমরা বলতে পারি না যে, পিতামাতা অনুমতি না দিলে সালাত, সিয়াম, যাকাত ইত্যাদি ‘ফরয আইন’ ইবাদত না করে তাদের খিদমত করতে হবে।

এজন্য আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ফকীহগণ একমত যে, জিহাদ ফরয কিফায়া বা সামষ্টিক ফরয, কিছু মুসলিম তা পালন করলে অন্যদের ফরয আদায় হয়ে যায়। তবে যারা পালন করবেন তারাই শুধু সাওয়াব লাভ করবেন, অন্যরা গোনাহ থেকে মুক্ত হবেন। তবে শত্রুবাহিনী যদি দেশ দখল করে নেয় অথবা রাষ্ট্রপ্রধান সকল নাগরিককে যুদ্ধে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেন তবে এ অবস্থায় জিহাদ ফরয আইনে পরিণত হয়। আল্লামা কুরতুবী বলেন:

الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقيين، إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين

“যে বিষয়ে ইজমা বা ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হলো, উম্মাতে মুহাম্মাদীর সকলের উপর জিহাদ ফরয কিফায়া। যখন কিছু মানুষ তা পালন করবে তখন অন্য সকলের দায়িত্ব অপসারিত হবে। তবে যখন শত্রুগণ ইসলামী রাষ্ট্রে অবতরণ করে (দখল করে নেয়) তখন তা ফরয আইন হয়ে যায়।”[12]

ফুটনোট

- [1] সূরা (৪) নিসা: ৭১ আয়াত।
- [2] সূরা (২) বাকারা: ১৮৩ আয়াত।
- [3] সূরা (২) বাকারা: ২১৬ আয়াত।
- [4] সূরা (১৭) ইসরা/ বানী ইসরাঈল: ৭৮ আয়াত।
- [5] সূরা (৪) নিসা: ৯৫ আয়াত।
- [6] সূরা (৯) তাওবা: ৩৮-৩৯ আয়াত।
- [7] বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৭০০।
- [8] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৫০৩।
- [9] সূরা (৯) তাওবা: আয়াত ১২২।
- [10] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১০৯৪; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৭৫।

[11] আবু দাউদ, আস-সুনান (১৫-কিতাবুল জিহাদ, ৩৩-বাবুন ফির রাজুলি ইয়াগযু ওয়া আবায়াহ্ কারহিনি); আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/৩২৭। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ লি-গাইরিহী বলেছেন।

[12] কুরতুবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ (৬৭১ হি), আল-জামি লি আহকামিল কুরআন ৩/৩৮।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7219>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন